স্থিতিশীল গণতন্ত্র ও সমানুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

স্থিতিশীল গণতন্ত্র ও সমানুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

মুরাদ পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
সাজ্জাদ মুরাদ
মুরাদ পাবলিকেশন্স
৫৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

পরিবেশনায় ঃ
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশ দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

প্রকাশকাল ঃ
১ম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০২
পৌষ ১৪০৮
শাওয়াল ১৪২২

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

স্থিতিশীল গণতন্ত্র ও সমানুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অচলাবস্থা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের সংকট সৃষ্টি করে রেখেছে। দেশের জন্য ইতিবাচক কাজের চাইতে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডই অনেক সময় প্রাধান্য পেয়ে যায়। ক্ষমতাসীন দলের লক্ষ্য হয়, যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং বিরোধী দলের লক্ষ্য হয়, যে করেই হোক ক্ষমতা দখল করা। গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের আগ্রহ এবং নেতাদের অঙ্গীকার সত্ত্বেও বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চর্চা মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি বরং ক্ষেত্র বিশেষে সুবিধাবাদী রাজনীতির ধারাই প্রবল। বিরোধীদলে থাকলে শতকরা একশত ভাগ গণতন্ত্র এবং সরকারীদলে গেলে স্বৈরাচারী আচরণ কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকার কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালনা গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমেই জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে থাকে। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়। অনেক দেশেই নামকাওয়াস্তে নির্বাচন হয়ে থাকে যেখানে জনগণের মতামতের সঠিক প্রতিফলন ঘটে না। বাংলাদেশের মত উন্নয়ন ও ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচন নিয়ে নানা কথা রয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা পেয়েছে তাতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি। অনেক উত্থান-পতন ও চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে বাংলাদেশ বর্তমান পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

১৯৪৬ সালের গণভোটের ফসল ছিল ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ ও উপমহাদেশের আযাদী লাভ। ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে আলাদা স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যত দ্রুত ভারতে সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তানে তা সম্ভব হয়নি। ভারত মাত্র নয় মাসের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করে নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে পাকিস্তান ৯ বছরেও গণতান্ত্রিক সংবিধান দিতে ব্যর্থ হয়। ১৯৫৪ সালে শুধুমাত্র পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ক্ষমতাসীন দলের এতে ভরাডুবি হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের একটি শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারী হবার ফলে তাও কার্যকর হতে পারেনি। ১৯৬২ সালে সামরিক শাসক কর্তৃক পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে মৌলিক গণতন্ত্র নামক এক অদ্ভুত ব্যবস্থা কায়েম করা

www.pathagar.com

হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে গোটা পাকিস্তান ব্যাপী আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের ফলে তদানীন্তন শাসনের উৎখাত হয় কিন্তু পুনরায় দেশটি সামরিক শাসনের আওতায় চলে যায়। প্রচণ্ড জনমতের চাপে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে প্রথমবারের মত গোটা পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পিপল্‌স পার্টি সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে। কেন্দ্রের সামরিক শাসকদের সাথে পিপল্‌স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর যোগসাজসের ফলে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে চক্রান্ত করা হয়। বঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তানকে এভাবেই স্বাধীনতার পথে ঠেলে দেয়া হয়।

১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যদিয়ে বিজয় লাভ করে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশের মর্যাদা অর্জন করে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের জন্য যারা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে জয় লাভ করেন তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি গণপরিষদ বা Constituent Assembly ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করে। ১৯৭২ সালের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশে বৃটিশ ধাচের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করা হয়। তবে পাকিস্তান আমলের যেসব রাজনৈতিক দল ছিল বিশেষভাবে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম ও পিডিপি নিষিদ্ধ করা হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে অন্যতম জাতীয় মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে ঘোষণা করে ধর্মভিত্তিক দল গঠনকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। যদিও বা আওয়ামী লীগের জন্ম একটি ধর্মভিত্তিক দল হিসাবেই। কারণ মুসলিম লীগের বিদ্রোহী অংশ আওয়ামী মুসলিম লীগের মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে ১৯৫৪ সালেই আওয়ামী লীগ গঠন করা হয়। যাহোক ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে দলের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ ছিল। মাত্র সাতজন বিরোধী দলীয় সদস্য এতে নির্বাচিত হয়।

১৯৭৫ সালেই মস্কোপন্থী কমুনিষ্টদের খপ্পরে পড়ে মরহুম শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা খতম করে এক দলীয় বাকশালী ব্যবস্থা কায়েম করেন। সকল দল নিষিদ্ধ করা হয়, সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকারী কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের পর্যন্ত তথাকথিত জাতীয় দল বাকশালে যোগদানে বাধ্য করা হয়। একনায়কত্ববাদী শাসনের কবলে বাংলাদেশে দুর্নীতিবাজ লুটেরাদের দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে অনিবার্যভাবে সেনাবিদ্রোহ ঘটে এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এক ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন হয়। শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হবার পর আওয়ামী লীগের একাংশের নেতারা খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে ক্ষমতার মসনদে বসেন। খন্দকার মোশতাক

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার অন্যতম সিনিয়র সদস্য ছিলেন এবং কতিপয় সদস্য বাদে মুজিব কেবিনেটের অধিকাংশ লোকদের নিয়েই খন্দকার মোশতাক মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং সামরিক শাসনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। পাকিস্তানের মতই সেনা কর্মকর্তাদের বুটের তলায় বাংলাদেশেও গণতন্ত্র পিষ্ট হতে থাকে। দুর্ভাগ্যের পরিহাস যে, সেনাশাসক জিয়াউর রহমানই বাংলাদেশে মুজিবী সংবিধান সংশোধনী রহিত করে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করেন।

মরহুম শেখ মুজিব যদি আজীবন প্রেসিডেন্ট থাকার স্বপ্ন না দেখে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল রেখে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে উৎসাহিত করতে পারতেন এবং হত্যা ও প্রতিশোধের পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে মুকাবিলা করতেন তাহলে তার নিজের মর্মান্তিক পরিণতি হতো না এবং গণতন্ত্র হত্যার জন্য ইতিহাসে তাকে দায়ী হতে হতো না।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানে গণতন্ত্র কার্যতঃ চলতে পারেনি এবং সামরিক ছত্রছায়ায় দেশ পরিচালিত হয়। গোটা পাকিস্তানে মাত্র একটি সাধারণ নির্বাচনের (৭০ সাল) সুযোগ পেয়েছেন দেশের মানুষ। বাংলাদেশের ১৯৭১ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ৭৩, ৭৯, ৮৬, ৮৮ সালে নির্বাচন হলেও কেবলমাত্র ১৯৯১ সালেই একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাকী নির্বাচনগুলোর সবকটাই ছিল ক্ষমতাসীনদের দ্বারা প্রভাবিত। বিগত ২৯ বছরের মধ্যে মাত্র ১২ বছর বাদ দিলে বাকী সময়টা সামরিক কর্তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল রাজনীতির উপর বা দেশ পরিচালনায়।

প্রকৃতপক্ষে বিগত অর্ধশতাব্দীর বেশীকাল যাবত বাংলাদেশে সামরিকতন্ত্র, মৌলিক গণতন্ত্র, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি, একদলীয় শাসন ও সংসদীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চলেছে। কিন্তু অদ্যাবধি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোনো শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি। রাজনৈতিক অস্থিরতা শুধু গণতন্ত্র নয়–দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার অন্তরায় হয়ে আছে। এ সংকট নিয়ে এখনই আমাদের ভাবতে হবে এবং একটি টেকসই গণতন্ত্র আমাদের গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় দেশের ভবিষ্যত এবং অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

সত্যিকার অর্থে পাকিস্তানের ২৪ বছর ১৯৪৭-৭১ গণতন্ত্র চালু হয়নি বা হতে দেয়া হয়নি। ফলে গণতন্ত্রের ফসল দেশের মানুষ ভোগ করতে পারেনি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকরই হতে দেয়া হয়নি। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের ১৯৭১-২০০০ সাল পর্যন্ত সময়েও প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র কার্যকর রূপ লাভ করতে পারেনি। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে যে প্রবাসী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয় তাতে শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট (পাকিস্তানের কারাগারে

www.pathagar.com

ছিলেন) এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট) করা হয়। মিঃ তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশ ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন হবার পর ১০ই জানুয়ারী দেশে প্রত্যাবর্তন করে সম্ভবত ১২ই জানুয়ারী শেখ মুজিব নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। মাত্র সাড়ে তিন বছর এ পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা চালু ছিল। শেখ মুজিব নিজেই জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হত্যা করেন এবং জঙ্গী একদলীয় শাসন জাতির উপর চাপিয়ে দেন। এরপর ৭৯ সালে সামরিক কর্তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করা হলে সেটা ছিল প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন। ১৯৮২ সালে আবার বেসামরিক শাসনের পতন ঘটে এবং দীর্ঘ ৯ বছর চলে। ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নতুন যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে একমাত্র অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালে। প্রধান বিচারপতিকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দিয়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য। এ নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু করে। কিন্তু শক্তিশালী বিরোধী দল আওয়ামী লীগ অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে সাথে নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। এক পর্যায়ে বিএনপি ক্ষমতায় থাকার জন্য ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী একটি ভোটারবিহীন নির্বাচন করতে বাধ্য হয়। মাত্র কয়েকদিন টিকে থাকা ঐ সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংশোধন গ্রহণ করে বিএনপি পদত্যাগ করে। সাংবিধানিকভাবে গঠিত কেয়াটেকার সরকারের অধীন নির্বাচন হয় ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন। নানা কূটকৌশলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনের ফলকে প্রভাবিত করে ক্ষমতা দখল করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী দলসমূহের মধ্যে অসন্তোষ বিদ্যমান ছিল। বিএনপি, জাপা, জামায়াত ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে ১৯৯৯ সালের ৬ই জানুয়ারী। সংসদীয় ব্যবস্থা এবং কেয়ারটেকার সরকার কর্তৃক নির্বাচন পরিচালনা করার বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত করা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনীতি স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারেনি।

অর্থবহ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য কতগুলো উপাদান অপরিহার্য। ১. গণতন্ত্রে বিশ্বাসী শক্তিশালী রাজনৈতিক দল, ২. শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা, ৩. স্বাধীন বিচার বিভাগ, ৪. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদ মাধ্যম। স্থিতিশীল ও কার্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য গণতন্ত্রের বিকল্প নেই। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য উপরোক্ত উপাদানসমূহের উপরই

www.pathagar.com

প্রধানত নির্ভর করে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশের মধ্যেই গণতন্ত্র চর্চা এবং গণতান্ত্রিক কৃষ্টির অভাব রয়েছে। দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকর নয়। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নির্ভর নেতৃত্বই দলের নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। দলের গঠনতন্ত্রের চাইতে ব্যক্তির ইচ্ছাই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে দুই প্রধান দলের নিয়মিত কোনো কাউন্সিল অধিবেশন বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচনের কোনো ব্যবস্থা নেই।

ব্যক্তির সাহস ও সততার উপর নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ ও কার্যকর ভূমিকা নির্ভর করে। নিম্ন আদালত সম্পর্কে অভিযোগ থাকলেও উচ্চতর আদালত নাগরিক অধিকার রক্ষার উল্লেখযোগ্য ও সাহসী ভূমিকা পালন করছে।

সংখ্যা গরিষ্ঠ পদ্ধতির নির্বাচন

বাংলাদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠ পদ্ধতির যে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু রয়েছে এটাও জনমতের প্রতিফলনের ক্ষেত্রে এবং স্থিতিশীল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা বলে মনে হয়। অল্প সংখ্যক লোকের মতামতকেই গোটা নির্বাচনী এলাকায় জনমত হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। ফলে সকলের রাজনৈতিক চিন্তা ও মতামতের প্রতিফলন ঘটানো যায় না। বৃটেন, কানাডা, আমেরিকা, ভারত, পাকিস্তানসহ সাবেক বৃটিশ উপনিবেশসমূহে এ পদ্ধতিই চালু রয়েছে। মেজরিটি পদ্ধতিও বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। যেমন ঃ

১. আপেক্ষিক সংখ্যা গরিষ্ঠতা ঃ এতে প্রতি আসনের জন্য একজন সদস্য অথবা একটি আসনের জন্য একাধিক সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্সের জন্য এক আসনে দুইজন এমপি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল ১৮৮৫-১৯৪৫ পর্যন্ত। কানাডার প্রাদেশিক পরিষদ, গ্রীসের চেম্বার অব ডেপুটিস, তুরস্কের জাতীয় সংসদ (১৯৫০-৫৭) ও সুইজারল্যাণ্ডের ন্যাশনাল কাউন্সিলের (১৯১৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত) নির্বাচনে এক নির্বাচনী এলাকায় একাধিক সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

২. নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ পদ্ধতি ঃ (ক) এক নির্বাচনী এলাকায় দ্বিতীয় ব্যালট অথবা বিকল্প ভোট দেয়ার অধিকার। অর্থাৎ ৫০% এর কম ভোট হলে দ্বিতীয়বার নির্বাচন অথবা বিকল্প প্রার্থীকে ভোট দেয়ার নিয়ম। ফ্রান্সে চেম্বার অব ডেপুটিস নির্বাচনে ১৯২৮-৪৫ পর্যন্ত এক নির্বাচনী এলাকায় একজন সদস্য নির্বাচিত হবে কিন্তু তাকে অবশ্য ৫০% এর অধিক ভোট পেতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে দ্বিতীয় ব্যালট বা বিকল্প প্রার্থীকে ভোট দেবার ব্যবস্থা। ১৯৫৮ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচন এ পদ্ধতিতে হয়ে আসছে।

www.pathagar.com

(খ) এক আসনে একাধিক প্রার্থীর বেলায়ও অনুরূপ দ্বিতীয় ব্যালট বা বিকল্প ভোট দেয়ার পদ্ধতি বেলজিয়ামের প্রতিনিধি পরিষদ ১৯০০ পূর্ব পর্যন্ত এবং অষ্ট্রেলিয়ার সিনেটের নির্বাচন ১৯১৯-৪৯ পর্যন্ত এ পদ্ধতিতে হয়েছে।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নির্বাচন

প্রতিনিধিত্ব মূলক নির্বাচনের অন্য পদ্ধতিটি হলো সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে আসন সংখ্যা নির্ধারণের পদ্ধতি। এ পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে এ চিন্তাধারা যে সংখ্যা লঘু বা সংখ্যা গুরু তথা গোটা নির্বাচক মণ্ডলী যাতে পার্লামেন্টারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্ব করতে পারে বা তাদের মতামত প্রতিফলিত হতে পারে। ভোট দাতা জনগোষ্ঠীর আপেক্ষিক অবস্থানটা যাতে পার্লামেন্টে মোটামুটিভাবে প্রতিফলনের সুযোগ হয়। কোনো একটি ভোটদাতা গোষ্ঠী সংখ্যার দিক থেকে কম হলেও তাদের মতামতের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ যাতে পার্লামেন্টে থাকে তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু হয়। এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের অনেক উপায় আছে। তবে এর মূল কথা হচ্ছে জনগণের মধ্যে সমর্থনের অনুপাতে পার্লামেন্টে অবস্থান নির্ধারিত করা। জনগণের মধ্যে যেমন সমর্থন আছে তার অনুপাতে পার্লামেন্টে অবস্থান হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সেই অনুপাতে অবদান রাখতে পারবে। সংখ্যা লঘু ও সংখ্যা গুরু সকলেরই একটা যথার্থ প্রতিনিধিত্বের এবং সকল মতামতের যথার্থ প্রতিফলনের সুযোগ সৃষ্টি করে সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি।

সমানুপাতিক নিবার্চনেরও আবার অনেক রকম আছে। যেমন ঃ ১. দলীয় তালিকা প্রার্থী পছন্দের সুযোগবিহীন, ২. দলীয় তালিকা প্রার্থী পছন্দের সুবিধাসহ, ৩. মিশ্র পদ্ধতি (মেজরিটি পদ্ধতি+দলীয় তালিকা), ৪. একক স্থানান্তর যোগ্য ভোট পদ্ধতি।

বেলজিয়াম প্রতিনিধি পরিষদ নির্বাচনের জন্য সমানুপাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে ১৮৯৯ সাল থেকে। ডেনমার্ক পার্লামেন্ট (Folketing) নির্বাচনে এ পদ্ধতি অনুসরণ করছে ১৯২০ সাল থেকে। নেদারল্যাণ্ড (Second Chamber) এর জন্য ১৯১৭ এবং First চেম্বারের জন্য ১৯২৩ সাল, ইটালী চেম্বার অব ডেপুটিস নির্বাচনে এবং সুইডিস পার্লামেন্টের উভয় নির্বাচনে ১৯০৯ সাল থেকে, সুইডিস ন্যাশনাল কাউন্সিল নির্বাচনে ১৯১৯, গ্রীস চেম্বার অব ডেপুটিস নির্বাচনে (১৯৪৬-৫২), ফিনল্যাণ্ড পার্লামেন্ট নির্বাচনে (১৯০৬-৩৫) এবং লুক্সেমবার্গ চেম্বার অব ডেপুটিস নির্বাচনে ১৯১৯ সাল থেকে এ পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে।

www.pathagar.com

জার্মানী, (Reichstag) ১৯১৯-৩৩, চেকোস্লাভাকিয়া চেম্বার অব ডেপুটিস ও সেনেট (১৯১৯-৩৮) ও (১৯৪৫-৪৮), ফ্রান্স জাতীয় পরিষদ (১৯৪৫-৪৬) ইসরাঈল Knesset, তুরস্ক ১৯৬১ সাল থেকে এবং ঘানা ১৯৬৪ থেকে সমানুপাতিক পদ্ধতির অনুসরণ করে।

রিপাবলিক অব আয়ারল্যাণ্ড পার্লামেন্টের উভয় হাউসের নির্বাচন ১৯২২ সাল থেকে, নর্থ আয়ারল্যাণ্ড, সেনেট, ইউনিভার্সিটি MPS (১৯২১-৬৫) ও নিম্নকক্ষ ১৯২১-২৫ অস্ট্রেলিয়ায় কমনওয়েলথ সেনেট ১৯৪৯ সাল থেকে, সাউথ আফ্রিকা সেনেট ১৯০৯ সাল থেকে, মালটা সেনেট ও আইন পরিষদ ১৯২১ সাল থেকে এবং জিব্রাল্টার আইন পরিষদ (১৯৫০-৬৯) সমানুপাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে।

মেজরিটি পদ্ধতি ও সমানুপাতিক পদ্ধতি এ উভয় পদ্ধতিতেই ভালো মন্দ রয়েছে এবং সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক আছে। বাংলাদেশে আমরা নির্বাচনের সাথে যতটা পরিচিত তা মেজরিটি পদ্ধতি। বৃটিশ শাসনামলে ১৯৩৭ সালের নির্বাচন, ১৯৪৬ এর গণভোট এ অঞ্চলের জনগণের ভাগ্য নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭০-এর নির্বাচন বাংলাদেশে বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তন এনেছে। তবে ১৯৯১-এর নির্বাচনকেই একমাত্র অবাধ নির্বাচন হিসেবে এ দেশের জনগণ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনের অব্যাহত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এখানকার রাজনীতি অগ্রসর হয়নি বরং বলা যায় জনগণ মাঝে মাঝে নির্বাচনের স্বাদ গ্রহণ করতে পেরেছে। মেজরিটি পদ্ধতির নির্বাচন বৃটেনসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে। পৃথিবীর অনেক দেশই এ পদ্ধতির পরিবর্তে সমানুপাতিক বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছে। একটি পদ্ধতির সাথে আমরা পরিচিত বলেই সেই পদ্ধতিটিই বহাল রাখতে হবে এটি যেমন কোনো যুক্তি হওয়া উচিত নয় তেমনি নতুন একটি পদ্ধতি অনেকে অনুসরণ করছে শুধু এ কারণেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে সেটাও কোনো যুক্তি নয়। বর্তমান মেজরিটি পদ্ধতি যদি আমাদের জন্য তেমন কোনো ভাল ফল না দিয়ে থাকতে পারে তথাপি সেটাকেই ধরে রাখতে হবে এমন চিন্তা-ভাবনার অবকাশ নেই। আমাদের সততার সাথে দেখা দরকার যে, কোন্ পদ্ধতিটি আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীলতা দিতে পারে।

নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ত্রুটি মুক্ত করতে পারার উপরই গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করছে। যদি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত ও ক্ষমতা দখলের জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে নির্বাচনের যে আসল উদ্দেশ্য বিভিন্ন মত ও

www.pathagar.com

পথের প্রতিফলনের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করা তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে। নির্বাচনে যদি ভোটারদের মতামতের প্রতিফলন স্বাধীনভাবে না ঘটানো যায় তাহলে গণতন্ত্র অচল ও অর্থহীন হয়ে পড়বে। আমাদের দেশের বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। এজন্য নির্বাচনী আইন সংস্কারেরও প্রশ্ন উঠেছে। আমাদের দেশের যে কটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ করলে এটা সুস্পষ্টভাবে বের হয়ে আসবে যে, আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেন শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারছে না।

আমাদের বাংলাদেশের প্রচলিত মেজরিটি পদ্ধতির নির্বাচনে যেহেতু কম সংখ্যক ভোটারের সমর্থনে সরকার গঠিত হয় এবং মেজরিটি ভোটারদের প্রতিনিধিগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে না ফলে রাজনীতির অংগনে নির্বাচন হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যা লঘিষ্ট দলই কার্যতঃ দেশ চালায় ও সরকার পরিচালনা করে। ফলে বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট লোকের সংখ্যাই বেশী থেকে যায়। তারা সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পার্লামেন্টকে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সুযোগ পায়। ফলে দেশে লক্ষ্যহীন রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।

মেজরিটি পদ্ধতির পরিবর্তে সমানুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন চালুর প্রস্তাবকে অনেকে একটি নন-ইস্যুকে ইস্যু বানানোর প্রশ্ন তুলতে পারেন। নির্বাচন ব্যবস্থা হচ্ছে দেশের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নেতা ও শাসক নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া। সুতরাং জাতির জন্য এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ প্রক্রিয়া যদি ত্রুটি পূর্ণ এবং অস্বচ্ছ হয় অথবা এতে যদি ইনসাফের সাথে সকলের মতামতের প্রতিফলন নিশ্চিত না করা যায় তাহলে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদ জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও সকল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হওয়ার পরিবর্তে কোনো কোনো গোষ্ঠী ও ব্যক্তি স্বার্থের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব বর্তমান মেজরিটি পদ্ধতির পরিবর্তে বাংলাদেশে সমানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালুর বিষয়টি আমরা অতীব সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার পক্ষে।

মেজরিটি পদ্ধতির দুর্বলতা, অসামঞ্জস্যতা ও ব্যর্থতা এবং সমানুপাতিক পদ্ধতির সম্ভাবনাময় দিকসমূহ যার মাধ্যমে অধিকতর কার্যকর প্রতিনিধিত্বমূলক পার্লামেন্ট গড়ে তোলা সম্ভব তা পুংখানুপুংখভাবে বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। উপরন্তু কোন পদ্ধতিটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অধিকতর প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম তাও বিবেচনা করতে হবে।

www.pathagar.com

মেজরিটি পদ্ধতিতে শক্তিশালী দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ আছে। এ প্রক্রিয়ায় সরকার পরিচালনায় যেহেতু জনগণের একাংশ অর্থাৎ বিজয়ী দলের মতামতকেই গোটা দেশের জনগণের ও সকলের মতামত বলে গণ্য করা হয় তাই বহুদলীয় মতামত প্রতিফলনের কোনো সুযোগই থাকে না। এ পদ্ধতি মেজরিটি পার্টিকে স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কত্ববাদী স্বেচ্ছাচারী শাসনের দিকে ঠেলে দেয়। এ পদ্ধতিতে আপেক্ষিক মেজরিটি দল যার পার্লামেন্টে সদস্য সংখ্যা অন্য দলের চাইতে বেশী সেই দলই সরকার গঠন করে থাকে। ভোটের দিক থেকে বা আসন সংখ্যার দিক থেকে কম হলেও তারা সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়। ফলে দলীয় লোকদেরকে সর্বত্র অগ্রাধিকার দেয়া হয়। দলীয়করণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করে কার্যতঃ দলীয় ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেয়া এবং যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের সঠিক জায়গায় কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। প্রশাসনকে পর্যন্ত দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের আওতায় আনা হয়। এতে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বাড়তে থাকে। ফলে সরকারী সুযোগ থেকে বঞ্চিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ পদ্ধতিতে ক্ষমতাসীন দলটি সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন পেলেও সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং অভিজ্ঞতা থেকে এটাই প্রমাণিত যে মেজরিটি পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ সময়ই এমন সরকার গঠিত হয় যে সরকার সংখ্যালঘু ভোটের প্রতিনিধিত্ব করে অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেজরিটির প্রতিফলন ঘটে না।

বৃটেন একমাত্র দেশ, যে দেশটি দীর্ঘতম সময় যাবত এ পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। বৃটেনের ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ৮৫ বছরের ইতিহাসে দেখা যায় ২৩টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ ক্ষেত্রে মাত্র ৫টি নির্বাচনে বিজয়ী দল প্রদত্ত ভোটের ৫০% ভাগ বা তার চাইতে বেশী ভোট পেয়ে সরকার গঠন করে। বাকী ১৮টি নির্বাচনেই ৫০% ভাগের কম ভোট পেয়েই পার্লামেন্টে সরকার গঠনের জন্য পর্যাপ্ত আসন লাভ করে এবং সরকার গঠন করে দেশ শাসনের অধিকার লাভ করে। ১৯৫১ সালে ঘটে মজার ঘটনা। লেবার পার্টি ৪৮.৫% ভাগ ভোট পেয়ে কনজারভেটিভ পার্টির নিকট পরাজিত হয়। অথচ রক্ষণশীল দল ভোট পায় ৪৮%। কারণ ছিল যে রক্ষণশীলরা আসন পায় ৫০.৫% ভাগ এবং লেবার পার্টি ৪৮.৫% ভাগ ভোট পাওয়া সত্ত্বেও আসন লাভ করে ৪৭ ভাগ। ভোট বেশী পেয়েও নির্বাচনে পরাজিত হয় লেবার পার্টি এবং কম ভোটেই জিতে যায় রক্ষণশীল দল। নিম্নে উল্লেখিত বৃটেনের ১৮৮৫-১৯৭০ সাল পর্যন্ত ৮৫ বছরের নির্বাচনী ফলাফল সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করলে পরিষ্কার হবে যে, এ পদ্ধতি ভোটারদের ইচ্ছার প্রতিফলন

www.pathagar.com

ঘটাতে কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কেবলমাত্র ১৮৯২ সাল এবং ১৯২৩ সালের দু'টি নির্বাচন বাদে বাকী সকল নির্বাচনে ভোটারদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেনি। ভোট প্রাপ্তি সামান্য কম বেশী হলে আসন প্রাপ্তিতে ব্যাপক পার্থক্য দলের অবস্থান পরিবর্তন করে দিয়েছে। জনগণের প্রদত্ত ভোটের অনুপাতে পার্লামেন্টের প্রতিনিধিত্ব যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

ছক—১

বৃটেনের সাধারণ নির্বাচন ১৮৮৫-১৯৭০

	কনজারভেটিভ		লিবারেল		লেবার		অন্যান্য	
নির্বাচনের বছর	ভোট%	আসন%	ভোট%	আসন%	ভোট%	আসন%	ভোট%	আসন%
১৮৮৫	৪৪	৩৭	৪৯	৫০	-	-	৭	১৩
১৮৮৬	৫১.৫	৫৯	৪৫	২৮	-	-	৩.৫	১৩
১৮৯২	৪৭	৪৭	৪৪	৪১	-	-	৯	১২
১৮৯৫	৪৯	৬১	৪৬	২৬.৫	-	-	৫	১২.৫
১৯০০	৫১	৬০	৪৬.৫	২৭.৫	-	-	২.৫	১২.৫
১৯০৬	৪৪	২৩.৫	৫৫	৬৪	-	-	১	১২.৫
১৯১০ (জানুঃ)	৪৭	৪০.৫	৪৩	৪১	৮	৬	২	১২.৫
১৯১০ (ডিসেঃ)	৪৬	৪১	৪৪	৪০	৭	৬	৩	১৩
১৯১৮	৩৫	৫৪	২৩	২৩.৫	১৫	১০	২৭	১২.৫
১৯২২	৩৯	৫৬	২৯	১৮.৫	২৯.৫	২৩	২.৫	২.৫
১৯২৩	৩৮	৪২	২৯.৫	২৬	৩০.৫	৩১	২	১
১৯২৪	৪৭	৬৭	১৮	৬.৫	৩৩	২৪.৫	২	২
১৯২৯	৩৮	৪২	২৩.৫	১০	৩৭	৪৭	১.৫	১
১৯৩১	৫৫	৭৬	১১	১২	৩০	৮.৫	৪	৩.৫
১৯৩৫	৫৪	৭০	৬.৫	৩	৩৭.৫	২৫	২	২
১৯৪৫	৪০	৩৩	৯	২	৪৮	৬২	৩	৩

www.pathagar.com

১৯৫০	৪৩	৪৭.৮	৯	১.৫	৪৬	৫০.৪	২	০.৩
১৯৫১	৪৮	৫০.৫	২.৫	১	৪৮.৫	৪৭	১	০.৫
১৯৫৫	৪৯.৮	৫৫	২.৭	০.৯	৪৬.৩	৪৪	১.২	০.২
১৯৫৯	৪৯.৪	৫৮	৫.৯	০.৯	৪৩.৮	৪১	০.৯	০.১
১৯৬৪	৪৩	৪৩	১১	১.৪	৪৪	৫০.৩	৫.৩	০.১
১৯৬৬	৪২	৪০	৮.৫	২	৪৮	৫৮	১.৭	০.১
১৯৭০	৪৬.৪	৫২.২	৭.৫	১	৪৩	৪৫.৫	৩.২	১

ছক—২

সরকারের প্রতি জনসমর্থন-বৃটেনের সাধারণ নির্বাচন ১৯১০-১৯৭০

		ভোট		আসন	
নির্বাচন	সরকার	সরকার	অন্য সকল দল	সরকার	অন্য সকল দল
১৯১০ (জানুঃ)	লিবারেল	২,৮৭৩,২৫১	৩,৭৯৪,৫৫৩	২৭৫	৩৯৫
১৯১০ (ডিসেঃ)	লিবারেল	২,২৯০,০২০	২,৯৪৪,২৭৩	২৭০	৪০০
১৯১৮	কোয়ালিশন	৫,১৮০,৬৪১	৫,৬০২,০৪৬	৪৮৫	২২২
১৯২২	কনজারভেটিভ	৫,৫০০,৩৮৭	৮,৮৯৩,২৫০	৩৪৪	২৭১
১৯২৩	লেবার	৪,৪৩৮,৫০৮	১০,১১০,০১৩	১৯১	৪২৪
১৯২৪	কনজারভেটি	৭,৮৫৪,৫২৩	৮,৭৮৬,২৫৬	৪১২	২০৩
১৯২৯	লেবার	৮,৩৮৯,৫১২	১৪,২৫৮,৮৬৩	২৮৮	৩২৭
১৯৩১	কোয়ালিশন	১৪,৫৩২,৫১৯	৭,১২৩,৮৫৪	৫৫৪	৬১
১৯৩৫	কোয়ালিশন	১১,৮১০,৫৫২	১০,২১৫,১৫২	৪৩৩	১৮২
১৯৪৫	লেবার	১১,৯৯২,২৯২	১২,৯৮১,০০৬	৩৯৩	২৪৭
১৯৫০	লেবার	১৩,২৯৫,৭৩৬	১৫,৪৭৩,৭৪১	৩১৫	৩১০

www.pathagar.com

১৯৫১	কনজারভেটিভ	১৩,৭১৮,০৬৯	১৪,৮৭৮,৬২৬	৩২১	৩০৪
১৯৫৫	কনজারভেটিভ	১৩,৩১৫,৮৯১	১৩,৪৪৩,৮৩৮	৩৪৫	২৮৫
১৯৫৯	কনজারভেটিভ	১৩,৭৫০,৯৬৫	১৪,১১১,৭৭৩	৩৬৫	২৬৫
১৯৬৪	লেবার	১২,২০৫,৮১২	১৫,৪২১,৩৩৬	৩১৭	৩১৩
১৯৬৬	লেবার	১৩,০৬৪,৯৫১	১৪,১৯৮,৬৫৫	৩৬৩	২৫৭
১৯৭০	কনজারভেটিভ	১৩,১৪৪,৬৯২	১৫,২০০,১১৫	৩৩০	৩০০

প্রদত্ত ছক নং ১ ও ২ থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, বৃটিশ মেজরিটি পদ্ধতি মেজরিটির শাসনের নিশ্চয়তাও দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯১০ সাল ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মাত্র দু'টি সরকার ১৯৩১ ও ১৯৩৫ প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের বেশী ভোট লাভে সক্ষম হয় তবুও এ দু'টোই ছিল কোয়ালিশন সরকার। ১৯২৯ এবং ১৯৫১ সালের সরকার দু'টি আপেক্ষিক মেজরিটিও লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

ছক—৩

কানাডার সাধারণ নির্বাচন (হাউজ অব কমনস)

		ভোট	আসন
১৯৫৩	লিবারেল	২,৭৪৪,৮২০ = ৪৮.৫%	১৭০ = ৬৪%
	কনজারভেটিভ	১,৭৪৯,০০৯ = ৩১%	৫১ = ১৯%
	সিসিএফ (লেবার)	৬৩৬,২৯২ = ১১%	২৩ = ৯%
	অন্যান্য	৫১০,১৩৫ = ৯.৫%	২১ = ৮%
১৯৫৭	লিবারেল	২,৭০৪,৬৯০ = ৪০%	১০৬ = ৪০%
	কনজারভেটিভ	২,৬৫৬,৩১২ = ৩৯%	১১১ = ৪২%
	সিসিএফ	৭০৭,৮৩৩ = ১১%	২৩ = ৯%
	অন্যান্য	৬৩০,৬৯৭ = ১০%	২৫ = ৯%
১৯৬৮	লিবারেল	৩,৫৮৩,০৯০ = ৪৫.৩%	১৫৪ = ৫৮.৪%
	কনজারভেটিভ	২,৪৮৩,৫৯৭ = ৩১.৪%	৭১ = ২৬.৮%

www.pathagar.com

	নিউ ডেমোক্রেটিক	১,৩৫৭,৪৪৩ = ১৭.২%	২৩ = ৮.৭%
	সোসাল ডেমোক্রেডিট (কুইবেক)	৩৪৭,৫৯৭ = ৪.৪%	১৫ = ৫.৭%
	অন্যান্য	১৩১,৭৪৮ = ১.৭%	১ = ০.৪%
১৯৭২	লিবারেল	৩,৭২১,৪৮৬ = ৩৮.৪%	১০৯ = ৪১.৩%
	কনজারভেটিভ	৩,৩৯১,৭১১ = ৩৫.১%	১০৭ = ৪০.৫%
	নিউ ডেমোক্রেটিক	১,৭১৩,৩৮৬ = ১৭.৭%	৩১ = ১১.৭%
	সোসাল ডেমোক্রেডিট	৭৩৮,০৩৮ =৭.৬%	১৫ = ৫.৭%
	ইনডিপেন্ডেন্টস	১১৪,১২০ = ১.২%	২ = ০.৮%

কানাডায় নির্বাচনের চিত্রও খুব একটা ভিন্ন নয়। ৩নং ছকে কানাডার চারটি সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হয়েছে। ১৯৫৩, ১৯৫৭, ১৯৬৮ এবং ১৯৭২ এ চার বছরের কানাডায় হাউজ অব কমন্সের নির্বাচনের ফলাফল থেকে দেখা ১৯৫৭ এর নির্বাচন বাদে বাকী নির্বাচনগুলোর অবস্থা বৃটেনের মতই।

বাংলাদেশের বিগত নির্বাচনসমূহের বিশ্লেষণ

নির্বাচিত হলেই গণতান্ত্রিক হয় না। একথাটার সাক্ষী বাংলাদেশ। ১৯৭৩ সালে নির্বাচনের মাধ্যমেই পার্লামেন্ট গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সেই পার্লামেন্ট গণতান্ত্রিকভাবে কর্মকাণ্ড চালাতে পারেনি। দলীয় স্বৈরাচারের হাতে বন্দী হয়ে যায় পার্লামেন্ট এবং পার্লামেন্টেই প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্র হত্যার এক নজীরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করা হয়। ১৯৯১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের অধীন নিরপেক্ষ নির্বাচনের সুফল ভোগকারী দল বিএনপি কেয়ারটেকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে বা কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা দিয়ে নির্বাচনে প্রথম রাজী হয়নি বরং একতরফা ভোটারবিহীন নির্বাচন করে ১৫ই ফেব্রুয়ারী এবং সেই পার্লামেন্টেই কেয়ারটেকার বিধান পাশ করে। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার দাপটে মেজরিটি ভোটারের দাবীকে উপেক্ষা করে যাচ্ছে। মেজরিটি ভোটারের প্রতিনিধিত্বশীল দলসমূহের দাবী উপেক্ষা করে পৌরসভা নির্বাচন ও ভোটারবিহীন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সম্পন্ন করেছে। ফলে বিরোধী দলসমূহ ওসব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রতিনিধিত্বকারী দলসমূহের দাবী প্রত্যাখ্যান করে জননিরাপত্তা আইনের খড়গ দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দেশে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিরোধী দলকে মোকাবিলার নামে সরকার পুলিশের ছত্রছায়ায় সশস্ত্র দলীয় ক্যাডারদের রাজ পথে নামিয়ে দিয়েছে। সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার প্রতিনিধিত্বকারী বিরোধী দলের বিরুদ্ধে সরকারের এ অবস্থান দেশে এক অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। ফলে পার্লামেন্ট একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। দেশকে এ রাজনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধার করার জন্য অনেকেই সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী তুলেছেন। দেশের চারটি প্রধান বিরোধী দল বিএনপি, জাপা, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট জোট বদ্ধ হয়ে সরকারের পদত্যাগ ও নির্বাচন দাবী করেছে। এটা হয়তোবা তাৎক্ষণিক একটা সমাধান হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য সুদূর প্রসারী একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন করে সমানুপাতিক হারের নির্বাচন পদ্ধতি চালুর জন্য প্রয়োজনীয় নির্বাচনী আইনের সংস্কার সাধন অনিবার্য। শুধুমাত্র সমানুপাতিক পদ্ধতি চালু করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে আমরা এমনটা মনে করি না। বরং আমাদের ধারণা নির্বাচনী আইনেরও ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার উপযুক্ত শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করাও জরুরী হয়ে পড়েছে।

কেন সমানুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন ?

১. **প্রতিনিধিত্বের পরিধি সম্প্রসারণের জন্য ঃ** সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একটি নির্বাচনে সকল প্রদত্ত ভোটই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ফোরামে কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করার বা ভূমিকা পালনের সুযোগ পায়। অর্থাৎ মেজরিটি পদ্ধতিতে পরাজিত প্রার্থীকে প্রদত্ত ভোট নষ্ট হওয়ার যে ধারণা সমানুপাতিক পদ্ধতিতে কোনো ভোটই নষ্ট হবে না। পরাজিত প্রার্থী যে ভোট পান সেই ভোট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোনো কাজে আসে না। কিন্তু সমানুপাতিক পদ্ধতিতে যেহেতু দলকেই ভোট দেয়া হয়ে থাকে তাই সেই ভোট কাজে লাগে অর্থাৎ 'পঁচে' যায় না। এ পদ্ধতির মাধ্যমে সকল মতের প্রতিফলন ঘটে থাকে পার্লামেন্টে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে আসন লাভ করে পার্লামেন্টে অবদান রাখতে পারে। দলের প্রকৃত জনসমর্থনের সাথে পার্লামেন্টে দলের অবস্থানের একটি সামঞ্জস্য থাকে। জনগণের মধ্যে যে শক্তি তা পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়। এর ফলে বড় দল ও ছোট দলগুলোর মধ্যে মতামতের আদান-প্রদান ও সহ-অবস্থানের রাজনৈতিক কালচার গড়ে উঠে যা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য।

www.pathagar.com

এ পদ্ধতির মাধ্যমে দলীয় রেষারেষি, বিরোধ ও উত্তেজনা হ্রাস করে ক্রমান্বয়ে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ও সহনশীল ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। সংখ্যালঘুদের বঞ্চনা ও হতাশা থেকে মুক্ত করে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার সহায়ক হতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় যেহেতু সকলেরই কমবেশী ভূমিকা বা আদান-প্রদান রাখার সুযোগ আছে তাই এর মাধ্যমে সমাজে একটি ব্যাপকতর জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে বিচ্ছিন্নতা ও বিভাজনের প্রবণতা থেকে সমাজকে বাঁচাতে পারে। ভাষা, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিভাজনের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে। নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, আয়ারল্যাণ্ড, নর্থ আয়ারল্যাণ্ড, ইসরাঈল এর দৃষ্টান্ত।

২. **রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঃ** সমানুপাতিক পদ্ধতিতে ব্যক্তি প্রার্থীর পরিবর্তে দলের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। ব্যক্তির প্রভাব পুরোপুরি উচ্ছেদ না করলেও পার্টি এবং পার্টির জাতীয় চরিত্রের উপরই গুরুত্বারোপ করা হয়। ব্যক্তির চাইতে দলের এ তুলনামূলক গুরুত্বের ফলে এ পদ্ধতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। দলকে যেহেতু বিজয়ী করার প্রশ্ন তাই দলকে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার দিকেই তৎপরতা ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তির চাইতে দলের কর্মসূচী, মেনিফেষ্টো প্রাধান্য পায় এবং দল ক্ষমতাসীন হলে জনগণকে কি দিতে পারবে তার ভিত্তিতেই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এটা রাজনৈতিক ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সামাজিক এবং আদর্শিক ইস্যুর দিকে নিতে এবং জাতির জন্য সঠিক রাজনৈতিক দিগদর্শন নির্ধারণে সহায়ক হয়। সারাদেশব্যাপী দলীয় সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করার ব্যাপারে দলের সর্বস্তরে তৎপরতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। দলীয় শৃংখলার উন্নতি হয় এবং দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয় দল ক্ষমতায় যেতে পারলে। ফলে রাজনীতিতে শৃংখলা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে এবং দলবদল ও ডিগবাজীর সম্ভাবনাও হ্রাস পাবে। অর্থাৎ গণতন্ত্র এ ব্যবস্থায় অধিকতর সুসংহত হবে।

৩. **রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ঃ** সমানুপাতিক পদ্ধতি পার্লামেন্টে অধিকতর শিক্ষিত, যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচিত করার সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। মেজরিটি পদ্ধতি প্রার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে প্রার্থীর ব্যক্তিগত প্রভাব, আঞ্চলিকতা, সামাজিক মর্যাদা ও খ্যাতি বংশীয়/গোত্রীয় অবস্থান, অর্থনৈতিক সামর্থ এবং সর্বোপরি বিজয় লাভের সম্ভাবনা ইত্যাদি অনেক বিষয় বিবেচনা করা হয়। এ পদ্ধতিতেই অনেক সময় অশিক্ষিত এবং অযোগ্য প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়ে

www.pathagar.com

আসার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু প্রার্থী যখন দল তখন দলের পক্ষে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, উচ্চ শিক্ষিত, জ্ঞানী, যোগ্য ও পরিক্ষীত ব্যক্তিকেই মনোনীত করতে পারে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কায়েমী স্বার্থবাদী মাস্তানদের সংখ্যা হ্রাস করে পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব।

৪. **অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ঃ** মেজরিটি পদ্ধতির চাইতে সমানুপাতিক নির্বাচনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সম্ভাবনা বেশী। যদি কোনো দল কারচুপিও করে তাহলে ফলাফলের আমূল পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না। ধরা যাক একটি দল ৩০% ভোট নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই দলটির যদি ৫% ভোট কারচুপি করে তাহলে ৫% আসন বেশী পাবে। কিন্তু মেজরিটি পদ্ধতিতে যদি ৫% কারচুপি করে তাহলে ৫০% বা তার চাইতেও বেশী আসন পেয়ে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দেখা গিয়েছে যে ৩৫% বা ৪০% ভাগ ভোট পেয়ে কোনো কোনো পার্টি ৬০% ভাগের বেশী আসন পেয়েছে। কিন্তু সমানুপাতিক পদ্ধতিতে এমনটি কখনও সম্ভব নয়।

৫. **আদর্শিক চর্চার বিকাশ ঘটবে ঃ** রাজনৈতিক দলসমূহ ভোটারদেরকে আঞ্চলিকতা, গোষ্ঠীপ্রীতি, ব্যক্তি পূজার পরিবর্তে দলীয় আদর্শের দিকে আহ্বান জানাবে এবং সেভাবেই জনমত গড়ে তুলতে প্রয়াস পাবে। নির্বাচন অভিযানের সময় দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচী কেন্দ্রীক আলোচনা হবে। এভাবে আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতি বিকাশে এ সমানুপাতিক নির্বাচন সহায়ক হবে। অনেক ইউরোপীয় দেশে আনুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচনের ফলে আদর্শ ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটেছে এবং পক্ষান্তরে গোত্রীয় এবং টাকার খেলার প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। Social Democratic Party কর্তৃক সুইডেনের ট্রাডিশনাল বাধা দূরীভূত হয়েছে এ নির্বাচন পদ্ধতির বদৌলতেই। ইউরোপীয় রাজনীতির এটা একটি ইতিবাচক দিক।

৬. **রাজনৈতিক সমীকরণ ঃ** কতিপয় ইউরোপীয় দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এটা আশা করা যায় যে, সমানুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন সমমনা রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে ব্যাপকতর সহযোগিতা এবং সমন্বয় ও সংহতি গড়ে তুলবে। দলসমূহের মধ্যকার চুক্তি ও জোটবদ্ধতা এসব দলকে অধিক জাতীয় চরিত্র অর্জন ও ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করবে। বিপুল সংখ্যক রাজনৈতিক দলের অর্থহীন প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে স্থায়ী জোটের আবির্ভাব রাজনৈতিক অংগনের কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশকে স্বচ্ছ করতে এ পদ্ধতি সাহায্য করতে পারে। নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক মেরুকরণ ও

www.pathagar.com

নিজেদের মধ্যে জোটবদ্ধ হবার প্রবণতা এ ব্যবস্থায় বৃদ্ধি পাবে। সম্প্রতি দেখা গেছে ইন্দোনেশিয়ার নির্বাচনে আটটি ক্ষুদ্র ইসলামী দল জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করে ৪০টি আসন লাভ করে দেশের পঞ্চম রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আনুপাতিক নির্বাচনের পদ্ধতি থাকার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।

৭. **অংশীদারিত্বের চেতনা ও আস্থা ঃ** মোটামুটি দেশব্যাপী একটি ন্যূনতম সমর্থন থাকলে ছোট দলও রাজনীতিতে টিকে থাকতে পারে এ পদ্ধতির মাধ্যমে। সম্পূর্ণ মূলোৎপাটিত হবার আশংকা থাকে না। রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান রাখে এমন সকল গ্রুপ পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাওয়ায় রাজনীতিতে সহিংসতা ও সন্ত্রাস তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পায়। কাংখিত ফলাফল এবং প্রকৃত ফলাফলের ব্যবধানটা কম হওয়ায় নির্বাচনী ফলাফল বিরুদ্ধে গেলেও সকল দলই তা মেনে নেয়।

৮. **ভিন্ন মতের প্রতি সহনশীলতা ঃ** আনুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচনের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং গ্রহণ করতে এ পদ্ধতি জনগণের মানসিকতার পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে। বিভিন্ন গ্রুপ ও দলের মধ্যে এক ধরনের সখ্যতা ও সহনশীলতা সৃষ্টি হয় এবং তাদের কোয়ালিশন সরকার গঠনেও এ ব্যবস্থা উদ্বুদ্ধ করে। যেহেতু সকল অঞ্চল, ভাষা, গোষ্ঠীর ও মতের প্রতিনিধিত্ব এ পদ্ধতিতে সহজতর এবং নীতি নির্ধারণী সর্বোচ্চ সংস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগও তাদের রয়েছে। তাই আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিবর্তে বৃহত্তর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়। ফলে জাতীয় রাজনীতি সুস্থ ধারা বিকাশে এ পদ্ধতি বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

৯. **নেতৃস্থানীয় ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জাতীয় রাজনীতিতে অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি করে ঃ** যেহেতু দলীয় তালিকার ভিত্তিতে এ নির্বাচন সম্পন্ন হয় সেহেতু দলের মধ্যে নেতৃস্থানীয় এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ পার্লামেন্টে ভূমিকা রাখার সুযোগ লাভ করে। ফলে পার্লামেন্টে বিভিন্ন ইস্যু বিতর্ক ও আলোচনার মানও উন্নত হতে বাধ্য। উপরন্তু অতি ক্ষুদ্র দলের সম্ভাবনাময় নেতারা ক্ষুদ্র দলের বড় নেতা হবার চাইতে বড় দলে শামিল হয়ে বড় দলের কাঠামোর মধ্যে রাজনীতি করতে আগ্রহী হয়। কারণ দল

www.pathagar.com

যদি এমন ক্ষুদ্র হয় যে, ন্যূনতম যত ভাগ ভোট পেলে পার্লামেন্টে আসন পেতে পারে তত ভাগও যদি না পায় তাহলে সেই দলে থেকে পার্লামেন্টে সদস্য হওয়া সম্ভব নয়। আর বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রের যে জোয়ার চলছে তাতে পার্লামেন্টে না যেতে পারলে রাজনৈতিক অস্তিত্ব বহাল রাখাই কঠিন। ফলে ছোট দলগুলোর মধ্যে বড় দলের সাথে একীভূত হওয়া অথবা বড় দলের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন ও রাজনীতি করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এতে দলের সংখ্যাও হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

বাংলাদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠ পদ্ধতির যে নির্বাচন ব্যবস্থা চালূ রয়েছে এটাও জনমতের প্রতিফলনের ক্ষেত্রে এবং স্থিতিশীল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা বলে মনে হয়। অল্প সংখ্যক লোকের মতামতকেই গোটা নির্বাচনী এলাকায় জনমত হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। ফলে সকলের রাজনৈতিক চিন্তা ও মতামতের প্রতিফলন ঘটানো যায় না। বৃটেন, কানাডা, আমেরিকা, ভারত, পাকিস্তানসহ সাবেক বৃটিশ উপনিবেশসমূহে এই পদ্ধতিই চালু রয়েছে। মেজরিটি পদ্ধতিও বিভিন্ন ধরনের রয়েছে।